বিজ্ঞান আন্বেষক -এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

37

বিজ্ঞান আন্বেষক

মো ঃ ৯৩৩২২৮০৬০২
১ ঘন্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৬ সংখ্যা ১ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি /২০০৯ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

হারিয়ে যাওয়া ধানের খোঁজে

মানুষ প্রথম গম জাতীয় শস্য (গম, ভুট্টা, বাজরা, মাইলো, যব ইত্যাদি) চাষ আয়ত্ব করেছিল সম্ভবত ৭/৮ হাজার বছর আগে। এই সময়কালে এর বিবর্তনও হয়েছে বিপুল। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য জাত। মানুষ ধান চাষ আয়ত্ত করেছে ১০/১৫ হাজার বছর। রুশ বিজ্ঞানী ভ্যাভিলভের মতে, ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, অসম হয়ে ব্রহ্মদেশের কোন এলাকায় প্রথম ধান চাষ হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়কালে ধান চাষের বহু বিবর্তন হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য

এরপর ৭ পাতায়

মহিলাদের ঘুম

ঘুম নিয়ে গবেষক, মনস্তত্ত্ববিদ, মনোবিদ, চিকিৎসক, স্নায়ুবিশেষজ্ঞ এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষ গভীরভাবেই চিন্তাভাবনা করে চলেছেন। পৃথিবীতে অর্থাৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবেত্তার অধিকারী মানুষই সবচেয়ে বেশী চিন্তাভাবনা করেছে ঘুম নিয়ে। তবে মজার কথা হল ঘুম যতক্ষণ স্বাভাবিক থাকছে কিংবা ঘুম যদিও বা একটু বেশীই হয় মানুষ তখন ঘুম নিয়ে কোনও চিন্তাই করে না। যত চিন্তা শুরু হয় ঘুম কমে গেলেই। ঘুম যদি ক্রমশই কমতে থাকে, তার দুশ্চিন্তা কালক্রমে

এরপর ৮ পাতায়

২৫ বছর পর ফিরে দেখা

ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়

মৃত ঃ ২৫ হাজার, আক্রান্ত (অসুস্থ ঃ ৫ লাখ)

১) ১৯৮৪ সালের ২-৩ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপাল শহরে ইউনিয়ন কার্বাইড (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (কার্বামেট বা সেভিন জাতীয় কীটনাশক উৎপাদনকারী কারখানা) থেকে মিথাইল আইসোসায়ানোট (মিক) জাতীয় মারণগ্যাস লিক হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ভূপাল 'মৃত নগরী'তে পরিণত হয়েছিল। সমগ্র ভূপাল ও আশপাশের পরিবেশে বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

২) সরকারী মতে ১৯৮৪ থেকে ২০০৩ দীর্ঘ ১৯ বছরে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক শিল্প-দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, ৫ লাখের বেশী মানুষ নানা ধরনের রোগে (শ্বাসকষ্ট, অনিয়মিত জ্বর, কাশি, স্নায়ুজনিত রোগ, দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা, অবসাদ, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, জীনগত পরিবর্তন সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগ) ভুগছে। কোনরকম ওষুধ বা ডাক্তারী পরিষেবা নেই বললেই চলে। প্রায় প্রতিদিনই গড়ে গ্যাস আক্রান্ত হয়ে ১ জন করে মানুষ মারা যাচ্ছে। প্রতিঘন্টায় ৮০ জন মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসছেন।

৩) ১৯৯৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর পরিবেশমন্ত্রী লোকসভায় জানান যে ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইডের জমি জেলাশিল্প দপ্তর দখল নিয়েছে। ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষকে সবরকম পরিবেশের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেমন আবর্জনা, দূষিত জল ও বিষাক্ত পদার্থগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে। অথচ ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষ আজ অবধি কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।

৪) ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ১০টি গবেষণা সংস্থা ভূপাল শহর ও তার আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে জল, মাটি, জলাশয়, পুকুর, কলের জল, আবর্জনা, ভূগর্ভস্থ হল, বুকের দুধ, শাকসবজি-নমুনা বেশ কয়েকবার ধরে পরীক্ষা করে তাদের ফলাফল দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

সমীক্ষা ও গবেষণার ফলাফলগুলি

ক) সিটিজেনস্ এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি মাটি ও জল এর নমুনা পরীক্ষা করে জানিয়েছেন ডাইক্লোরো বেনজিন সহ বেশকিছু দূষিত পদার্থ মাটি ও জলে পাওয়া গিয়েছে।

খ) ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (নিরি) জল, মাটি ও জলাশয়গুলি পরীক্ষা করে জানিয়েছে নানা ধরনের বিষাক্ত

এরপর ১ পাতায়

পরিবেশ সম্পর্কে সৌন্দর্য চেতনা

১

'Aesthetics'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো সৌন্দর্যতত্ত্ব। 'Aesthetics' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে গ্রিক 'Aisthetikas' ধাতু থেকে। ওই ধাতুটির অর্থ হলো 'to perceive', ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'ঈক্ষ' ধাতুর সঙ্গে গ্রিক 'Aisthetikas'-এর সাদৃশ্য লক্ষ করে বলেছিলেন ঃ

" 'Aisthetikos' ধাতুটি প্রধানত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বুঝায় এবং গৌণতঃ যেকোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এমন কি সংকলন বা

এরপর ৮ পাতায়

ধান গাছের পোকা

আজ আপনাদের ধানগাছের তিনটি পোকা সম্বন্ধে জানাবো।

(১) পোকার বিজ্ঞানসম্মত নাম — লেপ্‌টোকোরিসা ভ্যারিকরনিস (*Leptocorisa Varicarnis*)

বর্গ — হেমিপ্‌টেরা (order- Hemiptera)

পরিবার বা গোত্র — কোরাইডী (Family- Coreidae)

গায়ে দুর্গন্ধওয়ালা একরকম পতঙ্গ। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে এর নাম গন্ধিপোকা দেওয়া হয়েছে। ইংরাজীতে বলা Rice Gandhi Bhg.

অবস্থান — ভারতের প্রায় সর্বত্রই এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এরপর ৬ পাতায়

ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়

১ পাতার পর

কীটনাশক (সেভিন, লিনডেন) পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি মানুষের শরীরে নানা রোগ সৃষ্টি করে।

গ) জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর (ভূপাল) জলের নমুনা পরীক্ষা করে জানিয়েছেন কোন জলের নমুনাই পানের যোগ্য নয়, নানা ধরনের বিষাক্ত পদার্থ জলের মধ্যে মিশে রয়েছে।

ঘ) মধ্যপ্রদেশের রাজ্য গবেষণা সংস্থা জলের নমুনাতে বিভিন্ন ধরনের দূষণের সন্ধান পেয়েছেন। ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড ২২ ধরনের রাসায়নিক ভূপালের কারখানায় জমা করে রাখত, যার মধ্যে প্রায় সবগুলিই পরিবেশের জল, বায়ু ও মাটিকে নানাভাবে বিষাক্ত করেছে। যেমন কার্বারিল, টলুইন, মিথাইল আইসোসায়ানেট, ফসজিন, বেনজিন, মারকারি, মনোমিথাইল অ্যামিন প্রভৃতি।

ঙ) ইন্ডিয়ান টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (লক্ষ্মৌ) ভূগর্ভস্থলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রত্যেকটি নমুনাই পানের অযোগ্য ও বিষাক্ত।

চ) গ্রীনপিস সংস্থা গবেষণা করে জানিয়েছেন ক্যানসার জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ, নানা ধরনের ভারী ধাতু, কার্বারিল, বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড, অর্গানো-ক্লোরিন সহ বিষাক্ত কীটনাশক ভূপালের আশপাশের জল, আবর্জনা, জলাশয়, মাটি প্রভৃতির মধ্যে ভীষণভাবে পাওয়া গেছে।

ছ) ভূপালের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন কারখানার চারপাশের মাটিতে নানাধরনের কীটনাশক যথা ডাইক্লোরো বেনজিন, ট্রাইক্লোরো বেনজিন, টেট্রাক্লোরো বেনজিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে।

১০টি অঞ্চল থেকে ভূগর্ভস্থ জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে ক্রোমিয়াম, নিকেল, মারকারি, বেনজিন (Benzene) হেক্সাক্লোরাইড সহ বিষাক্ত পদার্থগুলির নমুনা বেশী মাত্রায় পাওয়া গেছে। যদিও সরকীরভাবে এই সমীক্ষার রিপোর্টকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

জ) গ্রীনপিস সংস্থার পক্ষ থেকে সমীক্ষা করে জানানো হয়েছে আশপাশের জলাশয় ও বিভিন্ন ধরনের কঠিন আবর্জনা থেকে পাওয়া 'বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড' মানুষের স্বাস্থ্যে এক বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। নানা ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি, জীনগত পরিবর্তন হবার ফলে হাজার হাজার মানুষ ভীষণভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

৫) ১৯৮৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের সুপ্রীমকোর্ট এক রায়ে মাত্র ৪৭ কোটি ডলার ত্রাণ দানের বিনিময়ে ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীকে ১৯৮৪ সালের ভূপালের জনগণকে হত্যা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিকলাঙ্গ ও নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টির দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি দিয়েছে। ভূপাল জেলা আদালতে মূল মামলার শুনানী ছাড়াই সুপ্রীমকোর্টের মতো ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষে এই রায় দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ভূপালের জনগণের কাছে এক ধরনের চরম বিশ্বাস ঘাতকতা। এই রায়ের বিরুদ্ধে সারা দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। গ্যাসে আক্রান্তদের বিভিন্ন সংগঠন ভূপাল গ্যাস পীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন, গ্যাস পীড়িত স্টেশনারী কর্মচারী সংঘ, জাহরিলি গ্যাস কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা ও ভূপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন এন্ড অ্যাকশন সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞান, পরিবেশ ও নাগরিক সংগঠনগুলি এই রায় বাতিলের দাবীতে ও পাশাপাশি ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবীতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

৬) গ্যাস বিপর্যয়ে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ টাকার অঙ্কে মাত্র ১৪৭৩ কোটি টাকা। ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ ধরলেও শুধু সুদ বাবদ ভারত সরকারের আরো ১৪৩৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ভারত সরকার খরচ করেছেন মাত্র ৩৩২ কোটি টাকা। সুপ্রীমকোর্টের মতে নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ধার্য ছিল জনপ্রতি ২ থেকে ৪ লাখ টাকা, অথচ ভূপালে ২০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল যাদের জন্য জনপ্রতি মাত্র ৮৯,৩০০ টাকা ধরা হয়েছে। সারা বছরের জন্য অক্ষমদের জনপ্রতি ক্ষতিপূরণ ধরা হয়েছে মাত্র ২৬,৫৪০ টাকা। সবমিলিয়ে ইউনিয়ন কার্বাইডকে যাবতীয় দায় থেকে মুক্ত রাখার সবরকম চেষ্টাই ভারত সরকার চালিয়ে যাচ্ছে।

৭) ২০০২ সালের ২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এর চেয়ারম্যান ডঃ দিলীপ বিশ্বাস মধ্যপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে ৫ দফা নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য সুপারিশ করেন, যার প্রতিটি নির্দেশেই ইউনিয়ন কার্বাইডকে কেন্দ্র করে। যথা- ১. পুকুর, জলাশয় বা ডোবাগুলিকে (ভূপাল ও তার আশপাশের) যাতে ব্যবহার যোগ্য করা যায় তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২. আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমে থাকা কীটনাশক, বিষাক্ত আবর্জনা গুলি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা যাতে ঐ সব অঞ্চলের লোকেরা নিরাপদে বসবাস করতে হবে। ৩. কোম্পানী কারখানার ভিতরে বিষাক্ত আবর্জনাগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে। ৪. ভূগর্ভস্থ হলে ও শস্য ক্ষেত্রে বিষাক্ত কীটনাশক ও দূষণ যাতে না ছড়াতে পারে সেই কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫. দূষিত জল, দূষিত এলাকাগুলি চিহ্নিত করা যাতে মানুষ, পশু ও কৃষিজাত পণ্য না মিশতে পারে। যেহেতু ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানী থেকে মিক গ্যাস লিক হয়েছিল এবং কোম্পানীতে কোনরকম দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ছিল না, সেহেতু সবরকম ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব ইউনিয়ন কার্বাইডকেই নিতে হবে।

ভূপাল শহর ও আশপাশের অঞ্চলগুলিকে (গ্যাস বিপর্যয়ে আক্রান্ত) দূষণমুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এখনও পর্যন্ত কোনরকম কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন নি, শুধুমাত্র কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া গেছে, প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। আশপাশের পরিবেশ বিপর্যয় ক্রমশ আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

৮) ভূপাল গ্যাস বিপর্যয় এর পরে দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তি নীতির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে যায়। সর্বোচ্চ গবেষণা সংস্থা কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সি.এস.আই.আর) এর বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে মিক মারণ গ্যাসের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেন পরে অবশ্য ফসজিন্ (মারণগ্যাস ব্যবহার করে ইহুদিদের হত্যা করে ছিলেন) গ্যাসের উপস্থিতিও স্বীকার করে নেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশ্নে প্রতিটি শিল্প কারখানার দূষণ প্রতিরোধক

এরপর ৩ পাতায়

ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়

২ পাতার পর

ব্যবস্থা ঠিকমত কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা সরকারকে সঠিকভাবে জানাতে হবে। গবেষণা সংস্থাগুলি সঠিক ভাবে প্রতিটি শিল্পে দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার কথা সরকারকে জানাবেন। যেমন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ছাই সমস্যাটি সমাধানের জন্য ইলেকট্রো স্ট্যাটিক স্পেসিপিটেটর (Electro Static space pitator বা ESP) যন্ত্র খুবই কার্যকরী এছাড়াও মেকানিক্যাল ডাস্ট কালেকটর (Mechanical Dust Collector বা MDC)।

১৯৮৪ সালে ২-৩ রা ডিসেম্বর ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইডকে মিকগ্যাস লিক হবার আগেও ঐ কারখানায় প্রায় ৪/৫ বার ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কারখানার শ্রমিকরা নিরাপত্তার প্রশ্নটি বহুবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকারের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী লোকসভায় জানিয়েছিলেন ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন গলদ নেই।

৯) ভূপালে গ্যাসপীড়িতদের বিষয়ে জনগণের আদালতে ন্যায় বিচারের জন্য ১৯৯২ সালে একটি আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল কমিশন গঠন করা হয়। ১২টি দেশের প্রতিনিধি ও ১৪ জন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল কমিশন অন্ ভূপাল ১৯৯৪ সালের ১০ জানুয়ারী থেকে ২২ জানুয়ারী ভূপালে শিবির করে সমস্ত অভিযোগ শোনা হয়। কমিশন বিভিন্ন দিক খুব ভালোভাবে খতিয়ে দেখেন। গ্যাস বিপর্যয়ের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ — (ক) এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। (খ) গ্যাস বিপর্যয় সংক্রান্ত রোগগুলি নির্ণয় করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মস্তিষ্ক ও মানসিক ক্ষত। (গ) ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা জনসমক্ষে প্রচার ও প্রকাশ করা প্রয়োজন। (ঘ) গ্যাসে আক্রান্তদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সবরকম তথ্য জানার অধিকার থাকবে। (ঙ) গ্যাস পীড়িতদের সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে যাতে বেশী সংখ্যক সদস্য জাতীয় রাজ্য পর্যায়ের কমিশনে থাকার সুযোগ পান। (চ) চিকিৎসা ও সামাজিকভাবে যথাযথ ক্ষতিপূরণ যাতে গ্যাস পীড়িতরা পান, তার ব্যবস্থা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। (ছ) আশপাশের অঞ্চলের সমস্ত বিষাক্ত আবর্জনা যাতে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (CBI) মধ্যপ্রদেশ সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইনজিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (NEERI) সংস্থাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ভূপালের কারখানাটি দ্রুত সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে ফেলে। বিশেষত ভূগর্ভস্থ জল যাতে দূষিত না হয়, অথচ সরকার এবিষয়ে কোন সদর্থক ভূমিকা এখনো পর্যন্ত পালন করতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে এই সুপারিশগুলি কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন ধারাবাহিকভাবে ভারত সরকারের কাছে ও ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার কাছে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত অবস্থা ভালোর দিকে এগোচ্ছে না।

১০) ভূপালের গ্যাস বিপর্যয়ের প্রতিবাদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। অথচ আমাদের দেশের সরকার একধরনের নিরবতা পালন করেছেন, পাশাপাশির রাজনৈতিক দলগুলি লজ্জাজনকভাবে নীরবতা পালন করেছেন, ভোটের রাজনীতিতে গ্যাস বিপর্যয় নিয়ে খুব বেশী হৈচৈ আদৌ হচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা আশু কর্তব্য। খোদ ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানী যেভাবে ২০ হাজার লোককে গণহত্যা করল, পাশাপাশি কয়েকলক্ষ লোক নানা অসুস্থতায় ভুগছেন, তার বিরুদ্ধে বেশকিছু সংগঠন ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ভূপালে সংস্থাগুলি হল ভূপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন এন্ড অ্যাকশন (BGIA), ভূপাল গ্যাসপীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ব্যক্তিরা হলেন সতিনাথ সারোঙ্গী, আবদুল জব্বর, রসিদা বি (Rashida Bi) প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীরা ভূপাল গ্যাস বিপর্যয় এর ঘটনা নিয়ে ১৯৮৪ সাল থেকেই সরব হয়েছিল। নো মোর ভূপাল কমিটি, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (NISC, Naihati), বিজ্ঞান দরবার (কাঁচরাপাড়া) সহ বহু ছোটবড় বিজ্ঞান সংগঠনের কর্মীরা গ্যাসপীড়িত মানুষদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ক) ভূপালের গ্যাস বিপর্যয়ে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য ওষুধসহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসক পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়মিত ভাবে কাজ করে চলেছেন। খ) গ্যাসপীড়িতদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সভা, মিছিল, লিফলেট সহ প্রচার আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। গ) ১৯৮৪ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই ভূপাল দিবসে (২-৩ ডিসেম্বর) পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত সকল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটি দাবী নিয়ে বিজ্ঞানকর্মীরা লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘ) প্রতিটি শিল্পে দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে। ঙ) ভূপাল সহ অন্যত্র পরিবেশ দূষণে আক্রান্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও ত্রাণ পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। চ) পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন সরকারী রিপোর্ট জনস্বার্থে গোপন রাখা চলবে না। ছ) ইউনিয়ন কার্বাইড (UCIL) কোম্পানীকে ভূপালের আক্রান্তদের জন্য সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে UCIL এর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। জ) শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রয়োজনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং পাশাপাশি পরিবেশ যাতে কোনভাবেই দূষিত না হয় সে বিষয়টি খুব ভালোভাবে নজর রাখতে হবে। ঝ) কোনভাবেই চাষ যোগ্য জমির (Agricultural Land) চরিত্র বদল করে শিল্পের জন্য জমি নেওয়া উচিত নয়। ঞ) জলাভূমি ও বনাঞ্চলগুলি আরো ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা খুব জরুরী।

— জয়দেব দে
ফোন - ৯৪৭৪৩৩০০৯২

তথ্যসূত্র : i) Survey of Environment Report –2000-2007,
ii) Down To Earth (New Delhi),
iii) NEERI Reports

পরিবেশ সম্পর্কে সৌন্দর্য চেতনা

১ পাতার পর

সংকল্প পর্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।..."[১]

সে যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয়ে 'Aisthetics' কথাটি ব্যবহার করছি পরিবেশ বিষয়ে — পরিবেশ বিষয়ে সৌন্দর্যচেতনা (Aesthetic Sense of Environment)। বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রান্তে এসে যা আমরা একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছি। ... উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের অপরূপ পরিবেশ আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খন্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্ত ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে, কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। ...

"আবার, সেই প্রাচীন ভারতখন্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি, রেবা শিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তি যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশ ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা শিপ্রা নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে, অবন্তী বিদিশার পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।"[২]

মনে রাখতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রবীন্দ্রনাথ একথা লিখেছেন। আমরা জানি না একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই পরিবেশ দেখে রবীন্দ্রনাথ কী লিখতেন! ...

২

জনস্ফীতির হাত থেকে বাঁচতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা (Science and Technology) একসময় কৃষি বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। সেই বিপ্লবের হাত ধরে এসেছিল শিল্পবিপ্লব। সেই শিল্পবিপ্লব নিয়ে এসেছে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তড়িৎযান্ত্রিক এইসব শ্রমশিল্প শ্রমিকের পেশি নির্ভর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নতুন এক যুগের সূচনা করেছে — তা শ্রম নয় মানুষের মস্তিষ্ক নির্ভর। এর সূচনায় রয়েছে — ইলেক্ট্রনিক্স (Electronics), কম্পিউটার (Computer), মহাকাশ-বিজ্ঞান (Space Science), সমুদ্র-বিজ্ঞান (Oceanography), জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) প্রভৃতি।

জনস্ফীতির চাপে একদা কৃষিপ্রধান সমাজে যে ধ্বংসের ছায়া নেমে এসেছিল, কয়লা, তেল প্রভৃতি শক্তির উৎস আবিষ্কারে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে সমাজ সেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে জনস্ফীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্প কারখানা, যানবাহন প্রভৃতি থেকে পরিবেশ দূষণ, বনসম্পদ ও প্রাণিজগতের অবক্ষয়। ... বেহিসেবি যথেচ্ছ উন্নতির উন্মত্ততায় প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করা হয়েছে। মাটি, জল ও বায়ুর সম্পদকে হরণ করে যে উন্নতি; সেই উন্নতিতে কিছু মানুষের ভোগবৃত্তির জোগানে, পৃথিবীর অনেক মৌলিক সম্পদকে নষ্টই করা হয়েছে। ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি প্রায় কিছুই। বেহিসেবি উন্নতির নামে তাই আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ এসে যুক্ত হয়েছে। মানুষের জীবনায়নে, ঘরে ও পথপ্রান্তে।

৩

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রান্তে এসে আমরা এখন এক কঠিন ও অভাবনীয় সত্যের মুখোমুখি। পরিবেশ বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষের অস্তিত্ব। তাই পরিবেশ সম্পর্কে এখনই প্রয়োজন সৌন্দর্য চেতনা। ... সত্যি বলতে কি — পৃথিবীতে এত মানুষের দরকার নেই। এমন মানুষের দরকার যারা পৃথিবীটাকে রক্ষা করবে।[৩] একবিংশ শতাব্দীতে মানব ভবিষ্যতের সব থেকে বড়ো বিষয় হলো — মানবিক আচরণের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন (Sustainable Development)[৪], মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের ছন্দ রক্ষা করা। আর এই ছন্দ রক্ষা করতে হবে আমাদের। তা সম্ভব হবে পরিবেশ সম্পর্কে যদি সৌন্দর্যবোধ থাকে। পরিবেশকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার মানসিকতা যদি থাকে। সেজন্যে আধুনিকতার কাছ থেকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে হবে না। সভ্যতাকে পিছিয়ে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে, সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার দ্বারা উন্মোচন করা। আমাদের পরিবেশ ও উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রশ্নের, কেন্দ্রীয় সত্য কিন্তু আজ এই বিষয়টিই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক 'রক্তকরবী'র কথা উল্লেখ করি। ... পরিবেশ তথা চারপাশ যেখানে মানুষের বিকাশের পরিবর্তে মনুষ্যত্বের বিনাশের যন্ত্র — সেখানে শুদ্ধ প্রাকৃতিকতার অস্ত্র রক্তকরবীর মালা নিয়ে নন্দিনী-রঞ্জন-বিশু-ফাগুলালদের লড়াই। সেই রক্তকরবীর মালা শেষপর্যন্ত টিকে থাকার পরিবর্তে বেঁচে থাকার ইচ্ছের গলায় জয়মাল্য হয়ে দাঁড়ায়। দিন যাপনের প্রাণ ধারনের গ্লানির পরিবর্তে আনন্দময় বেঁচে থাকার খোলা আকাশ আর বিস্তীর্ণ পাকা ফসলের প্রতিমায় আমাদের পৌঁছে দেয়। ...

উল্লেখসূত্র ঃ

১. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সাহিত্য পরিচয়, ১৯৪৩, কলকাতা, পৃ. ২৮৭।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেঘদূত', প্রাচীন সাহিত্য, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১১, কলকাতা, পৃ. ১৪-১৫।

৩. সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এরকম কথা বলেছিলেন। কিছুদিন আগে।

৪. A.K. Ghosh, Conservation of Biodiversity for Sustainable Development in India, Dynamics of Ecosystem, 1995. দ্রষ্টব্য।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, নূতন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৭৫। রবীন্দ্রনাথ এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেনঃ "যক্ষপুর পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনন্দে নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। ..."

— স্বপন কুমার দে, ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮২৬৮২৭
এ-৮/৩৫২, কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

ফুলে গন্ধ নেই সে তো ভাবতেই পারি না ...

মনে পড়ে আশা ভোঁসলের সেই বিখ্যাত গান — ফুলে গন্ধ নেই, সে তো ভাবতেও পারি না। সেখানে গায়িকার গানের মতো আমরাও ভাবতেই পারি না যে গন্ধ ছাড়া ফুল হতে পারে কখনও। গন্ধরাজ, গোলাপ, বকুল, জুঁই, চাপা, রজনীগন্ধার সুবাসে কত হয়েছি মাতোয়ারা, তাদের সুগন্ধে সতেজ ঘ্রাণ নিয়ে কত গান, কবিতা রচিত হয়েছে সেই কবে থেকে, কত নিবেদিত প্রেমের শুরুর কথা যে এই সুগন্ধী ফুল — তা আমরা তো নয়ই, ফুলেরাও জানে না। ফুলের গন্ধ গায়ে মেখে কত কারও সুখশয্যার গল্পগাঁথার স্মৃতি জড়িয়ে — অথচ সেই ফুলের পরিচিত সুগন্ধ নাকি হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে। হ্যাঁ, এমন আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছে ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি, তাদের সাম্প্রতিক একটি গবেষণাত্রে। আর তখনই হয়ত আমাদেরও মনে পড়ে যায় সত্যিই তো গোলাপে তো আর আগের সুগন্ধ নেই, গন্ধরাজ, বকুলের গন্ধে তো আর ম ম করে না অতটা চারিদিক। তবে কি সত্যিই ... হ্যাঁ এমনটাই দাবী করছেন ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির পক্ষে জোস ডি ফুয়েনটস, কুইন ম্যাকফ্রেডারিক, জেমস ক্যাথিল্যাঙ্কাল প্রমুখরা। আর এর কারণ হিসেবে তারা দেখিয়েছেন বায়ুদূষণকে। প্রধানত পারমানবিক শক্তিকেন্দ্রও যানবহন জনিত বায়ুদূষণের ফলেই নাকি হারিয়ে যাচ্ছে ফুলের পরিচিত, মনমাতানো গন্ধ। আসলে পারমানবিক শক্তিকেন্দ্র ও যানবাহন থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া নাকি পথ সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করছে ফুল থেকে পরাগরেণু বহনকারী মৌমাছি কিংবা প্রজাপতিদের, তারা আর ফুল আর তার পরিচিত গন্ধের উৎসের খোঁজ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ছে। আর তার ফলেই পরাগবহনকারী কীটপতঙ্গ বিশেষ করে মৌমাছিরা যাদের কিনা বেঁচে থাকার প্রধান খাবার ফুলের মধু — ক্যালিফোর্নিয়া, নেদারল্যান্ডসহ সমগ্র পৃথিবী থেকেই হারিয়ে যাচ্ছে অতিদ্রুত।

তাহলে কী হল! এদিকে যে, সমগ্র বিশ্বজুড়েই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, Coal-fired Power plant এরই রাজত্ব। আর তার সঙ্গে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তজ্জনিত বেশকিছু অযাচিত সমস্যা। আমাদের মহান ভারতবর্ষের আর আমাদের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গের কথাই এ প্রসঙ্গে বলি। ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে ওঠার কামনায়, আকাঙ্খায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার অছিলায় পারমানবিক চুক্তি সমাপনের অদ্ভুত খেলায় মেতেছে। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও ডাও কেমিক্যাল, মিথাইল আইসো সায়ানাইট আর ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ভয়াবহ পরিণামের সাথে পরিচিত হয়েও কেমিক্যাল হাব স্থাপনের নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছে পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ণের (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট) তোয়াক্কা না করেই। নাম কা ওয়াস্তে কিছু সমীক্ষা, পর্যবেক্ষক দলের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যই আমাদের মহান নীতিনির্ধারকদের মূল উপজীব্য। 'পরিবেশ সুরক্ষা', 'পরিবেশ বান্ধব' পদ্ধতি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির সম্পর্কে তারা কিছু আদৌ জানেন কিনা, সন্দেহ হয় বৈকী। পরিবেশকে বাদ দিয়ে শুধুই শিল্পে এগিয়ে যেতে চাওয়া মানুষগুলোর হাতে অত সময়ই বা কোথায়?

দিল্লী, মুম্বাই, কোলকাতা বিশ্বের সর্বাধিক বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। উন্নতির গুলির অন্যতম। ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উন্নতির এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। মাথা পিছু আয়, ব্যয়, মাথাপিছু ক্রয় ক্ষমতায় ভারতবাসী এখন, অনেক এগিয়ে। বিলাসব্যসন আর ভোগের মেলবন্ধনে 'মানসিকতা' আর 'পরিবেশ যে ভয়ঙ্কর দূষণ — তা যে আমাদের অস্তিত্বের পক্ষেই বুমেরাং হয়ে ফিরবে তা বুঝি না, বুঝতেই চাই না, বুঝলেই নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য আর জড়ভরত থাকি। সমগ্র ভারতবর্ষের দুচাকা, চার চাকা আটচাকা যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। (এক্ষেত্রে পৃথিবীতে সর্বাধিক গাড়ি বিক্রির তালিকায় ভারত উপরের সারিতে) সঙ্গে বহাল তবিয়তে আছে পুরনো লকরঝকা, লরঝর গাড়িগুলি তাদের ক্ষতিকারক অস্তিত্বের জানান দিয়ে। দিল্লী, মুম্বই তাও আইনপ্রণয়ন করে, ১৫ বছরের পুরোন গাড়িগুলিকে রাস্তায় নামতে না দিয়ে, লাইসেন্স বাতিল করে, পুরনো গাড়ি ও অটোগুলিতে সি এন জি (কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে পরিবেশ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবার প্রয়াস চালাচ্ছে অন্ততঃ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। আর আমাদের রাজ্যে? মাথামোটা প্রশাসন নিজে থেকে বোঝে না, তাদের বোঝানোর জন্য আইন হয়। আইনকে চ্যালেঞ্জ করে অদ্ভুতভাবে উদাসীন থাকে তারা। যখন বোঝে তখন অনেক দেরী হয়ে যাওয়ার অপরাধবোধ, অনুশোচনা আর কর্মক্ষমতার কার্যকারীতার ব্যর্থতার নাগপাশ যখন কুরে কুরে খায় — অতঃপর উদ্যোগী হয় ... কিন্তু ভোটসর্বস্ব গণতন্ত্র, উন্নয়ন, দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা ইউনিয়ন (প্রধানত এক্ষেত্রে গাড়ির মালিকদের ইুনিয়ন ও তাদের শক্তিশালী প্রভাবের কথাই বলা হয়েছে) গুলি বাদ সাধে নীতিনির্ধারণ, নীতিপ্রণয়ন ও তার কার্যকারীতায়। আসলে বাঁধা পড়ে যায় আমাদের ভালো থাকতে চাওয়া, প্রাণভরে সতেজ বাতাস নেবার সুযোগ আর দূষণহীন বেঁচে থাকার অধিকার।

সম্প্রতি রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুদূষণের মান সম্পর্কিত সমীক্ষা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে যে ভয়াবহ অবস্থার কথা তুলে ধরেছে এবং জেলাগুলিতেও যেভাবে শিল্পায়ণের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে — তাতে বলাই বাহুল্য

এরপর ৬ পাতায়

ধান গাছের পোকা

১ পাতার পর

উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই এদের প্রাদুর্ভাব বেশি। উল্লেখ্য যে, উত্তর প্রদেশে এরা ধানচাষের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

খাদ্য-গাছ — এরা প্রধানত ধানগাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। তবে ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতি গাছও খায়।

আকৃতি এবং প্রকৃতি — গায়ের রঙ সবুজ অথবা হাল্কা বাদামি। প্রায় ২০ মিমি লম্বা হয়। বয়স্ক পোকার দুটো বড় বড় শুড় বা শুঁয়া, দুজোড়া ডানা থাকে। এর গা থেকে সবসময় উৎকট দুর্গন্ধ বের হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে গন্ধি পোকা। এই গন্ধ থেকেই এই পোকার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। লম্বা লম্বা ছয়টি পা (সন্ধি পদ), তিনটি সংযুক্ত 'টারসি' (Jointed tarsi, sing Tarsus = roughly the ankle) বা শুল্ফাঙ্খি থাকে। সকাল ও সন্ধ্যায় এদের তৎপরতা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

জীবনকথা — এই পোকা সারা বছর ধরেই ডিম পাড়ে। কিন্তু ধানগাছ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় আগস্ট থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। স্ত্রী পোকা গাছের পাতায় এক একবারে সারিবদ্ধভাবে ২৪ থেকে ৩০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। প্রত্যেক সারিতে ৬টি থেকে ২০টি পর্যন্ত ডিম থাকতে পারে। ডিম কালো, ডিম্বাকার, একটু চ্যাপ্টা ধরনের এবং প্রায় ১ মিমি লম্বা। স্ত্রী পোকা একরকম আঠালো পদার্থ নিঃসৃত করে, তাই দিয়ে ডিমগুলি গাছের পাতার সঙ্গে আটকে রাখে।

ছয়-সাতদিন পরে ডিম ফুটে 'নিম্ফ' (Nymph) বা শিশু পরী বের হয়। শিশু পরীর রঙ হালকা সবুজ, লম্বা লম্বা ছয়টি পা, কিন্তু ডানাহীন। ১৫ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে শিশু পরী পূর্ণাঙ্গ পোকায় রূপান্তরিত হয়। অবশ্য এর মধ্যে যে অন্তত ছয়বার খোলস বদলায়।

এই পোকার জীনচক্র সম্পূর্ণ হতে ৩০-৩৫ দিন সময় লাগে। এই সময় ধান-খেতে এদের ভীড় জমে যায়। জুলাই থেকে আরম্ভ করে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এদের বেশিরকম বংশবিস্তার ঘটে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এরা শীত ঘুমে কাটায়। আর মার্চ থেকে জুনমাস পর্যন্ত এরা শুধু ঘাস খায়। কারণ, তখন খেতে ধানগাছ থাকে না।

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ — এই পোকা ধান চাষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে আউস এবং বোরো ধানের। তবে অনেকসময় আমন ধানের ক্ষেতেও এরা হানা দেয়। গন্ধি পোকা এবং বাচ্চা শিশু পরী, উভয়েই ধানের শিষ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে, কচি ধানের ভিতরকার দুধ চুষে খেয়ে ফেলে। এর ফলে ওইসব ধানের মধ্যে আর চাল তৈরি হতে পারে না। সাধারণত আগস্ট থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যেই এইরূপ ধ্বংসাত্মক কাজ বেশি হয়ে থাকে। এর ফলে ধানের শিষ সাদা হয়ে যায় এবং ধানের মধ্যে চালের দানা থাকে না বলে ধান চিটা হয়ে যায়। তাছাড়া আক্রান্ত ধানের যেসব জায়গায় ফুটো করে রস চুষে নেওয়া হয়েছে, সেইসব জায়গায় ছত্রাকের আক্রমণ হয় বলে কালো কালো দাগ দেখা যায়। এতেও অনেক ক্ষতি হয়।

প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ — (ক) পোকা ধরার জাল দিয়ে পোকা ধরে, কেরোসিন তেলে গোলা ওষুধের সাহায্যে সেইসব পোকা মেরে ফেলতে হবে। (খ) সেচ সেবিত ধান খেতে কেরোসিন তেল মিশ্রিত ওষুধ (Spray) করলে বা ছিটিয়ে দিলে গাছের পাতায় তেল মিশ্রিত ওষুধের একটা সূক্ষ্ম স্তর পড়ে যায়। (গ) খেতের ধারে লম্ফ বা কূপি জ্বালিয়ে আলোর ফাঁদ পেতে রাখলে এইসব পোকা দল বেঁধে আলোর চারপাশে জড়ো হয় এবং কেরোসিন মিশ্রিত জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যায়। (ঘ) যেসব জায়গায় গন্ধি পোকার উপদ্রব বেশি, সেইসব জায়গায় এমন জাতের ধান চাষ করা উচিত, যার শিষে ধানের মধ্যে দুধ আসে একটু দেরিতে অর্থাৎ অক্টোবর মাসের পরে। তাহলেই পোকার আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। (ঙ) সময়মতো ধান খেতে নিড়ানি দিয়ে, ঘাস জাতীয় সবরকম আগাছা একেবারে নির্মূল করে ফেলতে হবে। তাহলে গন্ধি পোকার উৎপাত কম হবে। (চ) ধান গাছে ফুল ফোটার আগেই যন্ত্রের সাহায্যে ০.২৫ শতাংশ মাত্রায় বি এইচ সি (BHC) গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়। (ছ) ধান খেতে ২.৫ শতাংশ অ্যালড্রিন (Aldrin), ৫ শতাংশ ক্লোরডেন (Chlordane) এবং ৫-১০ শতাংশ বি এইচ সি গুঁড়ো ছিটিয়ে এই পোকার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

— শৈবাল কুমার গুহ
ফোনঃ ০৩৩-২৫৫৬৩৯১০

ফুলে গন্ধ নেই

৬ পাতার পর

বায়ুদূষণের ভবিষ্যত ভালো কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত! মন-প্রাণ দিয়ে আন্তরিকভাবে ভাবলেই গা একদম শিউরে ওঠে। এখন তো আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনকে লক্ষ্য করে বেড়ে ওঠা গণতন্ত্রের পূজারীদের কাছে শিল্প-কারখানার ধোঁয়া, ইটভাটার নিকর্ষকালো ধোঁয়া আর বায়ুদূষণ ভিনগ্রহের বস্তু। ওসব নিয়ে তারা কোনোদিন ভাবেও নি আর এখন তো ... থাক। নতুন করে না হয় নাইবা বললাম। কান পাতলেই তো শোনা যায়।

ফিরে আসি মন ভালো করে দেওয়া ফুল আর তার সুগন্ধের হারিয়ে যাওয়ার কথায়। আসলে বায়ুদূষণের এই যদি হয় হাল ভারতের আর পশ্চিমবঙ্গের তাহলে আমাদের ছোট থেকে বড়ো হয়ে ওঠার পথে চেনা পরিচিত ফুলগুলির দশা কী হবে! সর্বগ্রাসী আতঙ্ক তাড়া করে তখন। কী হবে তাদের অবিচ্ছেদ্য সুগন্ধের। ফিরে আসি আবার ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষণাপত্রের বিষয়টিতে। জোস ডি ফুয়েনটেস যিনি এই গবেষণার একজন অন্যতম সদস্য, তার কথায় শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে ফুলের গন্ধ ভেসে আসত ১০০০-১২০০ মিটার দূর থেকেও, আর এখন এই দূষণযুক্ত পরিবেশে মাত্র ২০০-৩০০ মিটার দূর থেকে ভেসে আসে ফুলের সুগন্ধ। আর আমাদের অভিজ্ঞতা বলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অতটা দূরও নয়, নাক লাগিয়েও পাওয়া যায় না তার গন্ধ। ফলস্বরূপ সমস্যাটি চক্রাকারে হচ্ছে। একদিকে পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে পরাগ সংযোগকারী মৌমাছিদের জীবনধারণের সমস্যা, সমস্যা ফুলগাছগুলির সমস্যা গন্ধের হারিয়ে যাওয়ার। আবার গন্ধের অভাবে মৌমাছি কিংবা প্রজাপতিরা খুঁজে পায় না তাদের

এরপর ৭ পাতায়

হারিয়ে যাওয়া ধানের খোঁজে

১ পাতার পর

জাতের, যা বিভিন্ন পরিবেশের বৈশিষ্ট্য উপযোগী। খুব বেশি জল সহ্য করতে পারে এমন জাতের ধান বেশি জল/ মাঝারি জল/ অল্প জল/ খরা পরিস্থিতি সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন জাত — এমন বহু জাত আছে যা পরিবেশ মানিয়ে উৎপন্ন। পোকা লাগে না, মাটির ও আবহাওয়ার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সহনশীল (Sustainable) ভাবে তৈরি হয়েছে। এদের জন্য কোন কৃত্রিম সার বা কীটনাশক বিষ আগে ব্যবহার হতো না। ফলন ছিল বিঘা প্রতি ৬/৭ মন থেকে ৮/১০ মন অবধি। কিছু জৈব সার দেওয়া হত।

৭০ দশকের সবুজ বিপ্ব সব কিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল অতি অল্প সময়ে। এল উচ্চফলনশীল জাতের ধান, রাসায়নিক সার, কীটনাশক বিষ। হারিয়ে গেল দেশি জাতের ধান, কৃষকদের বন্ধু ছিল কয়েকশত বৎসর ব্যাপি। এত সহজে এবং মসৃণভাবে এই বিচ্ছেদ ঘটল, প্রথমটা কেউই টের পায়নি। খাল কেটে যে কুমির ঢুকলো, তা আজ সমস্ত কৃষি প্রচেষ্টাকেই ধ্বংস করতে উন্মুখ। দেশি জাতের ধান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে।

আমাদের দেশের চাষীরা বীজ ধান কিনতো না। বাড়িতেই রাখা থাকতো। তা দিয়েই চাষের কাজ চলত নিরাপদে। খরা বন্যা যেমন ছিল, তেমনই খাদ্যাভাবও কিছু ছিল। এখন চাষীর হাত-পা বন্ধক ঋণদাতার কাছে। চাষে ঘাটতি। চাষীর পুঁজি নেই। চাষী পরিবারের স্বচ্ছলতা বিপন্ন।

কেন এমন হোল? সে অনেক কথা। চাষীর স্বনির্ভরতা ফিরিয়ে আনতে পূর্বের চাষাবাদের কথাও ভাবা হচ্ছে। পুরানো দেশি জাত ফের ফিরিয়ে আনতে হবে। এদের ফলন কিছুটা কম; কিন্তু স্বাদে ও গুণমানে অতুলনীয়।

অবশিষ্ট অংশ আগামী সংখ্যায়

— **দীপক কুমার দাঁ**, ফোন ঃ ৯৪৭৪১৯২৭৯৯

ফুলে গন্ধ নেই

৬ পাতার পর

খাবারের উৎস, গন্ধযুক্ত ফুল।

মাঠেঘাটে কাজ করা চাষীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে, সত্যিই কমে গিয়ে মৌমাছি, প্রজাপতিদের সংখ্যা। আমাদের সচেতন চোখেও তা ধরা পড়ে। বিশেষ করে ভ্রমর, প্রজাপতি যেন দিন দিন কমছে। আর তার থেকেও দ্রুত হারে নগরায়ণের প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে গাছ, ফুলের গাছ, ফুলের নান্দনিক বাগান। একটির সঙ্গে যে আরেকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। সত্যিই কমে গিয়েছে বিগত কিছু বছরে প্রজাপতি, ভ্রমরের সংখ্যা। আর তার জন্য যে বিশেষ করে গ্রীষ্মকালের বায়ুদূষণই দায়ী — এ সম্পর্কে আর কোনোই সন্দেহ নেই ফুয়েনটেস ও তার সহকারীদের।

এ সম্পর্কে গবেষণা করতে তারা একটি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মডেলের (ম্যাথমেটিক্যাল চল) সাহায্য নিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে তারা দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে ফুলের গন্ধ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে যায়। ফুল দ্বারা উৎপাদিত 'গন্ধ অণু' (Scent Molecules) গুলি ভীষণ উদ্বায়ী প্রকৃতির, যা কিনা খুব সহজেই বায়ুদূষণকারী দূষক পদার্থগুলির সঙ্গে মিশে যায়। বিশেষ করে মিশে যায় হাইড্রক্সিল, নাইট্রেট র‍্যাডিক্যাল-এর সাথে আর সেটাই কিনা ফুলের সৌরভ, সুমিষ্ট গন্ধকে ধ্বংস করে ফেলে। তার অর্থ হলো অনেকদূর একইরকম প্রকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যসহ ভেসে যাবার পরিবর্তে ফুলের সুমিষ্ট গন্ধের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, পরিশেষে আর কোনোরকম গন্ধই আর অবশিষ্ট থাকে না ফুলের। এইভাবে পরাগ সংযোগকারী মৌমাছি, প্রজাপতিরা আর গন্ধের ভরসায় ছুটে ছুটে না বেড়িয়ে তাদের বেশী ভরসা করতে হচ্ছে পর্যবেক্ষণের উপর। ফলস্বরূপ সমস্যা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে সুগন্ধস্তর (Scent Levels) এবং দূরত্ব-এর মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করে দেখিয়েছেন যে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে, শিল্পবিপ্লব পূর্ববর্তী যুগ থেকে পরবর্তী যুগে, বড় বড় শহরের দূষণযুক্ত বাতাস থেকে গ্রামের নির্মল বাতাসের ভিন্ন পরিস্থিতিতে ফুলের সুগন্ধ কেমন তার স্বাভাবিক চরিত্র বদলাচ্ছে। আর তাতেই দেখা গিয়েছে যে, অটোমোবাইল আর ভারীশিল্প পূর্ববর্তী যুগে ফুলের সুগন্ধ থেকে এখনকার এই দূষণ সর্বস্ব পৃথিবীতে বায়ুদূষণের প্রভাবে ফুলের প্রায় ৯০ শতাংশ সুমধুর গন্ধই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বলাই বাহুল্য যেসমস্ত অঞ্চলে বায়ুদূষণের হার কিংবা প্রভাব বেশী সেখানে ফুলের গন্ধ তত অধিক ও দ্রুতহারে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা — একথা বুঝতে আর পরিবেশবিদ হবার প্রয়োজন নেই।

অতএব ... আরো একটি সমস্যা। এই ফুলদর্শন আর সতেজ ঘ্রাণ না পাওয়ার সমস্যা। সমস্যা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পথে অন্যতম সুন্দর, প্রশান্তিময় অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে একেবারেই বঞ্চিত হবার সম্ভাবনার, সমস্যা যাকে কেন্দ্র করে শিশুর, মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্র রচনা করা হয় অনেক ক্ষেত্রেই তাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ের। সমস্যা জীববৈচিত্র্যের, জীববৈচিত্র্যের হ্রাসের, সমস্যা দূষণের, পরিবেশের, মানুষের, পৃথিবীর।

বোধহয় শেষ হয়ে এল 'এক মুঠো রজনীগন্ধার গান'-এর যুগ আর ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা ফুলের সময়ের — যে ফুলের সুবাস সমস্ত দিনের ধূলীধূসীরিত পরিবেশের, হতাশা, ক্লান্তিকে সযত্নে বিদায় করিয়ে মনে আনবে এক অনন্য রোমান্টিসজম — আনবে নতুন করে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, উদ্যোগ আর রচনা করবে পরিশ্রমের প্রেক্ষাপট। সুন্দর অভিজ্ঞতা, সুন্দর সম্পর্কের উপর ভর করে আমরাও গড়ে তুলবো এক সুন্দর পরিবেশ, এক অনন্য সুন্দর পৃথিবী। বোধহয় শেষ হয়ে এলো সেই সম্ভাবনার। তাই নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্রনায়কদের বোধোদয়ের অপেক্ষায় না থেকে আসুন আমরা আজ থেকেই ফুলের সুগন্ধ বাঁচিয়ে রাখতে যানবাহনের উপর কম নির্ভর করে একটু পায়ে হাঁটি, সাইকেল চালাই আর রিকশা চড়ি। তাতে একটু পরিশ্রম না হয় হলোই, আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বার্থে এতটুকু কি খুব বেশী? আমাদের ভুলে যেন ফুলের গন্ধই চিরতরে না হারিয়ে যায়। কারণ ফুল মানে যে আমরা, আমাদের শিশু, আমাদের ভবিষ্যৎ। So Save Aroma of flowers and Save us.

— **তুহিন শুভ্র মণ্ডল**, ফোন ঃ ৯৭৩৩২২৮৯৬৬

মহিলাদের ঘুম

১ পাতার পর

হয়ে যায় অতলস্পর্শী।

কাজেই ঘুম যে কতটা জরুরী, সেটা ভাষা দিয়ে লিখে বোঝানো যাবে না বা বোঝানোর প্রয়োজনও নেই। সংক্ষেপে বলা যায় ঘুমের চেয়ে হিতকর সঙ্গী আর কিছুই নেই। যেমন নন্দীগ্রামের আক্রান্ত মানুষের এখন সবচেয়ে বড় শত্রু কোনটা? উত্তরটা অবশ্যই হবে শত শত নারী, শিশু বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা এখন ঘুমোতে পারেন না। শান দেওয়া অস্ত্রের ঝনঝনানিতে, বারুদের বিস্ফোরণে নন্দীগ্রাম ঘুম হারিয়েছে। ঘুম হারিয়েছে সিঙ্গুরের মানুষ। জমি হারানোর শোক পিতৃশোকের চেয়েও বেশী, বলেছেন ইউরোপের বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ ম্যাকিয়াভেলী। জমি হারানোর শোকে মানুষ প্রায় অস্বাভাবিক, প্রায় উন্মাদের মতো আচরণ করছে। সিঙ্গুরের খাসের ভেড়ী, গোপালনগর, বাজেমেলিয়ার শত শত কৃষক এবং কৃষক রমণীরা জমির সঙ্গে হারিয়েছেন ঘুমও। ঘুম হারিয়ে তারা আত্মহত্যার 'সহজ' পথে চলা শুরু করেছেন।

ফলে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বাসন্তী, জয়নগর, কুলতলীর নাম নিঃসন্দেহে হতে পারে ঘুমহারা গ্রাম; নাম দেওয়া যায় নিদ্রাহীন জনপদ। চিন এবং মায়ানমারের মানুষও ঘুমহীনতার রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছে। চিনের ভূকম্পে মৃতের সংখ্যা প্রায় লাখে পৌঁছেছে। ফলে বেঁচে থাকা কি বিপুল সংখ্যায় মানুষ ঘুমহীন, জলহীন, খাদ্যহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন, কে তার হিসেব রাখবে?

ফলে এক একটা বিপর্যয় সেটা রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, আর্থিক যেমনই হোক, তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ঘটবে সাধারণ মানুষের ঘুমহীনতায়; নিদ্রাহীনতায়। সেজন্য দেখা যায় রাজনৈতিক নেতারা, মন্ত্রীরা, লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি, জেলা কমিটি, রাজ্য কমিটির মহান কারিগররা বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের সমর্থকদের রাতের ঘুমটাই কেড়ে নেয়। শাসককূল এমনভাবে অপারেশন চালায় যাতে বিরোধীদের ঘুম ছাড়া করে দেওয়া যায়।

নিদ্রাহীনতার এগুলো খুবই সহজ সরল ব্যাখ্যা। ইংল্যান্ডের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘুম বিশেষজ্ঞ এডুয়ার্ড সুয়ারেজ প্রায় ২১০ জন মাঝবয়সী পুরুষ এবং মহিলার ঘুমের স্তর, নিদ্রাহীনতা, রাত্রিকালীন ঘুমের সময় জেগে উঠবার মাত্রা অর্থাৎ ঘুম ভাঙ্গবার হার এসব নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। সংবাদ সংস্থা সেই গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছে। যে মাঝবয়সী ২১০ জন পুরুষ এবং মহিলার ঘুমের স্তর নিয়ে এডুয়ার্ড গবেষণা করেছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। ঘুম নিয়ে তারা কখনোই কোনও সমস্যাই পড়েননি।

গবেষকরা পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে রাত্রিকালীন ঘুমের ব্যাঘাত মহিলাদের মন এবং শরীরকে বেশী মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। অর্থাৎ নিদ্রাহীনতা পুরুষদের মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। অর্থাৎ নিদ্রাহীনতা পুরুষদের মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ততাকে মহিলাদের চেয়ে অনেক কম পরিমাণে সংগঠিত করে। মহিলাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হার অনেক বেশি থাকে। রাত্রিকালীন কম ঘুম মহিলাদের ব্লাড সুগার, রক্তচাপ, মানসিক অস্থিরতাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। ঘুমের পরের সকালে মহিলারা অনেক বেশী খিটখিটে হয়ে পড়ে এবং সাংসারিক কাজকর্মে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যাপারে মহিলারা রাগ, বিরক্তি, ক্ষোভ অনেক বেশী প্রকাশ করে থাকেন। গবেষকরা বলেছেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে আজও যেহেতু মহিলাদের সাংসারিক দায়দায়িত্ব অনেক বেশী বেশী করে পালন করতে হয়, কাজেই পুরুষের এটা দেখা প্রধান কর্তব্য যে মহিলারা যেন রাতে নিরুপদ্রবে ঘুমোতে পারেন। মহিলাদের ঘুমের পরিবেশকে নিশ্চিত করতে পুরুষদের দায়িত্বই বেশী। রাত্রে যতটা সম্ভব কম বিরক্ত করাই উচিত মহিলাদের। কিন্তু দেখা যায় ঠিক তার উল্টোটা। বাচ্চাকে দেখভাল করতে গিয়ে মহিলাদের রাতের ঘুম-এর দফারফা ঘটে গেলেও পুরুষটির ঘুমে কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না। দিব্যি সে নাক ডেকে ঘুমোতে থাকে। এমন কি বাচ্চার কান্না যাতে পুরুষটির কানে না ঢোকে সেটা দেখাই মহিলাদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মহিলাদের উপর পীড়ন (অবশ্যই পুরুষ কর্তৃক) মহিলাদের খুব শীঘ্রই বার্ধক্যের দিকে নিয়ে যায়। মহিলারা বুড়িয়ে যায় তাড়াতাড়ি। পুরুষরা এই ঘুমকে সুনিশ্চিত করবার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবেন এমনই আশা প্রকাশ করেছেন গবেষকরা। গর্ভাবস্থাকালীন ঘুম এবং শিশুকে লালন পালন করবার সময় ঘুম অত্যন্ত জরুরী। গবেষকরা এতদূর অবধি বলেছেন, বাচ্চা রাত্রে হঠাৎ করে জেগে উঠলে, বাবা যেন তাকে সামলানোর চেষ্টা করে মায়ের ঘুমকে সুনিশ্চিত করেন। কারণটি আগেই উল্লেখিত হয়েছে নিদ্রাহীনতার প্রভাব মায়ের শরীরে অনেক বড় আকার নিয়ে দেখা দেয়।

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে তাবৎ পুরুষকূল কিছুটা শিক্ষা নিলেও নিতে পারেন।

— শান্তনু বসু, চাঁচল কলেজ, মালদহ
ফোন - ৯৪৭৪৭২১৮৮৮

পত্রিকা যোগাযোগ

বিজ্ঞান দরবার-কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম (৯৪৩৪২১২০৪২)। তপন সেন, সেন ফার্মেসী, রেল বাজার আলিপুর দুয়ার জং, জলপাইগুড়ি। কলকাতা বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩। চন্দন রায়/চন্দন সুরভি দাস, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ২/১৪৫, বিজয়গড়, যাদবপুর, কল-৩২। মোঃ ৯৮৩১৬৯৩০৩৮

যোগাযোগ — বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০৯২।

সম্পাদক মন্ডলী — সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মালি (সহ সম্পাদক), বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)*

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in